শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং বন্ধ করা জরুরি

ডা. কামরুল হাসান খান

২৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০১৯ ০১:২২

ডা . কামরুল হাসান খান। ছবি : আমাদের সময়

গত ১৬ অক্টোবর বুধবার ২০১৯, সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা রুখে দেওয়ার শপথের মধ্য দিয়ে বুয়েটে আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা মাঠের আন্দোলনের ইতি টানলেন শিক্ষার্থীরা। শপথে তারা বলেছেন, বুয়েটের আঙিনায় আর যেন নিষ্পাপ কোনো প্রাণ ঝরে না যায়, আর কোনো নিরপরাধ যেন অত্যাচারের শিকার না হয়, সেটা সবাই মিলে নিশ্চিত করবেন। সেদিন বেলা সোয়া একটার দিকে বুয়েট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই শপথে বিপুল শিক্ষার্থী অংশ নেন। শপথ নেন বুয়েটের উপাচার্য ড. সাইফুল ইসলামসহ হলের প্রভোস্টরাও। তবে শিক্ষকরা মিলনায়তনে উপস্থিত থাকলেও শপথে অংশ নেননি।

শপথ পড়ান বুয়েটের ১৭তম ব্যাচের ছাত্রী রাফিয়া রিজওয়ানা। সবাই বুকে হাত রেখে শপথে অংশ নেন। ৬ অক্টোবর রাতে বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী। এর পর থেকেই আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আবরার হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধসহ ১০ দফা দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল করে রাখেন ক্যাম্পাস। সরকার এ ঘটনার পর পরই ত্বরিক ব্যবস্থা নিয়ে ১৯

জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা রিমান্ডে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের সাময়িক বরখাস্ত করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এবং ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। শিক্ষার্থীদের দাবি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং যেগুলো সময়সাপেক্ষ তা বাস্তবায়নাধীন আছে। আইনমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুয়েটের ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'অপরাধী যারাই হোক তারা অপরাধীই। অপরাধী কে কোন দলের, সেটা আমি কখনো দেখি না। অপরাধীদের বিচার হবেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'একই সঙ্গে সারাদেশে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হলে তল্লাশি চালানো হবে। কারা মাস্তানি করে বেড়ায় তা দেখা হবে।'

বুয়েটের আবরার হত্যাকা-ের ঘটনায় দেশের মানুষকে ভয়ঙ্করভাবে নাড়া দিয়েছে, উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের সেরা মেধাবী সন্তানরা লেখাপড়া করতে আসে সেখানে এ রকম অসুস্থ, ভয়ঙ্কর পরিবেশ দেশের মানুষ বুঝতেই পারেনি। পাশাপাশি দেশের তিনটি গৌরবের প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও বুয়েট-দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে আসছিল তাদের কৃতীমান ছাত্রদের জন্য। লাখ লাখ ছাত্রের মধ্যে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মেধা যাচাই করে ছাত্রদের ভর্তি হতে হয়। কোনো অসাধু উপায় অবলম্বন করার সুযোগ নেই। সবাই মেধাবী এবং অপার সম্ভাবনাময়ী। বুয়েটের এ ঘটনা ঘিরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে ভয়াবহ চিত্র অভিভাবকদের-দেশের সাধারণ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই সবাই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।

advertisement

বিগত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকায়, গণমাধ্যম এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু ছাত্ররাই নয়, র‍্যাগিংয়ের শিকার হন ছাত্রীরাও। র‍্যাগিংয়ের নামে নির্দয়, নিষ্ঠুর নির্যাতন ছাড়াও অশ্লীল, অসামাজিক কার্যকলাপ পর্যন্ত ঘটেছে। গত বছর ২০১৮ সালে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ওপর জরিপ পরিচালনা করে গোয়েন্দা সংস্থা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগ শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েও তারা কোনো অভিযোগ জানায়নি। শতকরা ৫৬ ভাগ শিক্ষার্থী বলেছিল, র‍্যাগিং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী বলেছে, র‍্যাগিং খুবই নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অমানবিক। তবে বড়দের ভয়ে ছোটরা র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী। তবে র‍্যাগিংয়ের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হলেও ফৌজদারি আইনে কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুরনো শিক্ষার্থীদের সখ্য গড়ে তোলার জন্য যে আনুষ্ঠানিক পরিচিতি প্রথা সেটাকেই র‍্যাগিং বলে অভিহিত করা হলেও তা দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রসিকতার ছলে র‍্যাগিংয়ের নামে যে প্রথা চলছে, তা এক কথায় টর্চার সেলে নিয়ে নির্যাতনের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ক্যাম্পাসে প্রথম পা রেখেই র‍্যাগিং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নবীন শিক্ষার্থীরা। এ নির্যাতনে পিছিয়ে নেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত সরকারি কলেজগুলোও।

র‍্যাগিংয়ের নামে নবীন শিক্ষার্থীদের ওপর চালানো হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। যেভাবে র‍্যাগিং করানো হয় তার মধ্যে আছে, কান ধরে ওঠবস করানো, রড দিয়ে পেটানো, পানিতে চুবানো, উঁচু ভবন থেকে লাফ দেওয়ানো, সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা দেওয়া, গাছে ওঠানো, ভবনের কার্নিশ দিয়ে হাঁটানো, মুরগি হয়ে বসিয়ে রাখা, ব্যাঙ দৌড়ে বাধ্য করা, সিগারেট-গাঁজা-মদপানে বাধ্য করা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করানো, সবার সম্মুখে নগ্ন করে নাচানো, যৌন অভিনয়ে বাধ্য করা, ছেলেমেয়ে হাত ধরা বা জোর করে আলিঙ্গন করতে বাধ্য করা, অপরিচিত মেয়ে অথবা ছেলেকে প্রকাশ্যে প্রেমের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করা, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে যৌন হয়রানি করা, দিগম্বর করা, ম্যাচের কাঠি দিয়ে রুম অথবা মাঠের মাপ নেওয়া, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ নেওয়া, শীতের মধ্যে পানিতে নামিয়ে নির্যাতন করা, পুরনো শিক্ষার্থীদের থুতু মাটিতে ফেলে নতুনদের তা চাটতে বলা, বড় ভাইদের পা ধরে সালাম করা, গালাগাল করা, নজরদারি করা, নিয়মিত খবরদারি করার মতো নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অমানবিক কর্মকাণ্ড। র‍্যাগিংয়ের মতো অপদস্থ ও নির্যাতনমূলক আচরণে অনেক শিক্ষার্থী

আতঙ্কে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অনেকে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে। তা ছাড়া যে শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছে, সে প্রতিরোধপরায়ণ হয়ে পরে এর চেয়ে বেশি মাত্রায় র‍্যাগিং করার পরিকল্পনা করছে এবং নতুন ছাত্রছাত্রীরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ওপর চড়াও হয়-এটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা প্রমাণিত। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চাঁদরাত' বলে একটা কথা আছে। সে রাতে নির্যাতনের বিভীষিকা নেমে আসে হলে হলে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের এই বিশেষ র‍্যাগিংয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত আছে অনেক মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহতা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হতে পারে সমাজে নতুন এক ব্যাধি ধীরে ধীরে জাতির মেধাবী সন্তানদের গ্রাস করে কঠিন আকার ধারণ করছে। প্রত্যেক মানুষের বয়সের আলাদা আলাদা গুরুত্ব আছে, যেমন-শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রাপ্তবয়স, বার্ধক্য-প্রত্যেক সময়েরই রয়েছে আলাদা সৌন্দর্য। নিন্তু নানা বিবেচনায় ১৬ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত বলা হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়-যখন মানুষ স্বপ্ন দেখে, বিকশিত হয়, ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, ঝুঁকি নিতে পারে, যুদ্ধে যেতে পারে, ফুল ফোটাতে পারে, ভালোবাসতে শেখে, দেশপ্রেম গাঘ হয়। সাহস-সততা, প্রতিশ্রুতি আর ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত থাকে শরীর-মন। আমরা যারা হলে- হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছি সেই মধুময় স্মৃতি মনে হলে নস্টালজিয়ায় ভরে যায় মন-মনে হয় আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম। আর এখন মনে হয় শিক্ষার্থীরা ভাবে কবে এ বিভীষিকা থেকে বেরোতে পারব। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য-সাংস্কৃতিকচর্চা, ক্রীড়া, বিতর্ক, প্রাণবন্ত আড্ডা-সবই হয়ে গেছে সীমিত। মনে হয় ক্যাম্পাসে শুধু পালিয়ে থাকা, আড়ালে থাকা। যারা নির্যাতিত হচ্ছে আর যারা নির্যাতন করছে সবাই আমাদের সন্তান, দেশের পরীক্ষিত মেধাবী সন্তান। তাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকার কথা অথচ এখন এরা হতাশা-যন্ত্রণায় নিমজ্জিত। সবাই হয়ে যাচ্ছে মানসিক বিকারগ্রস্ত-ভবিষ্যতে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, সামাজিক জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ধীরে ধীরে সমাজও হয়ে পড়বে অসুস্থ, সংকটময়। এ অবস্থান থেকে পরিত্রাণের জন্য জরুরিভাবে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে এবং পরিত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ দায়িত্ব শিক্ষকদের, সরকারের, অভিভাবকদের, রাজনীতিবিদসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের।

সবচেয়ে বড় দায় হচ্ছে শিক্ষকদের। তারাই প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রক, অভিভাবক এবং আদর্শের প্রতীক। কিছু কিছু শিক্ষকের দলাদলি, অনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং অতিমাত্রায় রাজনীতিমুখিনতা পরিবেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই ছাত্রদের সামনে শিক্ষকদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতেই হবে। শিক্ষকরা কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষক নন, তারা দেশ ও জাতিরও শিক্ষক। সে কারণে যুগে যুগে, দেশে দেশে শিক্ষকদেরই মর্যাদার সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়। সে মর্যাদা আমরা কতটা রক্ষা করতে পারছি-সেটি এ সময়ের একটি বড় প্রশ্ন। এ পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবান্ধব সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য কিছু প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট সবার গভীর বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি-

১। যে কোনো পরিস্থিতিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। তাদের হতে হবে নিরপেক্ষ, নিয়মতান্ত্রিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধি-প্রবিধির অনুসারী। তাদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে।

২। সরকার, রাজনৈতিক দল, অভিভাবক এবং সামাজিক সংগঠনকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

৩। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে, নইলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে। শিক্ষকদের ছাত্রদের প্রশ্নে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ এবং সহযোগী থাকতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক এবং আস্থা ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান।

৪। শিক্ষকদের প্রকাশ্যে রাজনীতি এবং দলাদলি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনোক্রমেই ছাত্রদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। সব ছাত্রই যেন তাদের অভিভাবক মনে করতে পারে।

৫। শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে এবং শিক্ষকদের পাঠদানে (সব শিক্ষা কার্যক্রমে) অনিয়মের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপস বা গাফিলাতি গ্রহণযোগ্য হবে না।

গোটা বিশ্ব অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদের মতো উন্নয়নশীল ছোট দেশের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। সব ক্ষেত্রের জন্যই রাজনীতি একটি বড় কারণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করে নতুন প্রজন্মকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া

আমাদের সবার দায়িত্ব-সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি।

অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান : সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়